পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন
২০২৬

একটি বিদ্যায়তনিক পর্যালোচনা সংকলন

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়
চাঁপাডাঙা, হুগলি

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন ২০২৬

একটি বিদ্যায়তনিক পর্যালোচনা সংকলন

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়
চাঁপাডাঙা, হুগলি
একটি রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় প্রকাশনা

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্যাপন ২০২৬
একটি বিদ্যায়তনিক পর্যালোচনা

Published by
IQAC
&
Publication Cell
Rabindra Mahavidyalaya

Publisher
Dr. Prasanta Bhattacharyya
Principal, Rabindra Mahavidyalaya

Date & Place of Publication
20th June 2026, Champadanda, Hooghly, W.B, India

www.rabindramahavidyalaya.ac.in

© রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, ২০২৬

প্রকাশ • জুন ২০২৬

মুখবন্ধ

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের অবকাশ সবে সবে শেষ হয়েছে। যদিও গরমের দাপট তখনও চরমে। এরই মধ্যে সরকারি নির্দেশ এসেছে— আগামী ২০শে জুন সমস্ত কলেজে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে। অধ্যক্ষ মহাশয়ের জরুরি তলবে সাড়া দিয়ে জানতে পারলাম, আসন্ন দিনটিতে কী কী পরিকল্পনা কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে চাইছেন। আমার ওপর ভার পড়ল শিক্ষক-ছাত্র যৌথ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক একটি বিদ্যায়তনিক পর্যালোচনামূলক সংকলন প্রস্তুত করার। প্রস্তাবের আকস্মিকতায় প্রাথমিকভাবে নিজে যে খানিক অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, অস্বীকার করব না। কারণ আর কিছুই নয়, হাতে সময় ছিল দুটোমাত্র আস্ত দিন। তবু নিজের রাজ্যের জন্য, যে রাজ্য নিয়ে, যার ভাষা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে, চিরকাল মনে মনে কত-না জমা আবেগ, কতই-না অব্যক্ত গর্ব, সেই রাজ্যের জন্য বছরের একটা দিন উদ্‌যাপিত হবে ভাবতেই এতটা ভালো লাগছিল, পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ছিল না। তাছাড়া ছিল আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অগাধ আস্থা। অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে এটুকু নিশ্চিন্তি ছিল যে, আমরা শিক্ষকরা অনেকেই নানান ব্যস্ততার কারণে পেরে না উঠলেও, অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের কোনো উদ্যোগ কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবে না। এরই মাঝে জানতে পারি আমাদের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী অভিজিৎ বাগ ওইদিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছেন। অভিজিৎ বন্ধু মানুষ এবং অত্যন্ত সজ্জন। চেপে ধরলে ফেরাতে পারবেন না জানতাম। উনি বক্তৃতা লিখিত আকারে একদিন আগে দিয়ে দেওয়ার পরিশ্রমে রাজি হয়ে গেলেন। প্রত্যয় জাগল। নিজেও যদি কিছু একটা ছোটো করে লিখে ফেলতে পারি, মুখবন্ধ অন্তত।

প্রযুক্তি প্রবণতা গড়ে তোলে তাকে ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করার। সেই প্রবণতা বশত, যখন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে একটা লেখা তৈরির প্রস্তুতি নিতে বসলাম, প্রথমেই গিয়ে হাজির হলাম চ্যাট জিপিটির দরবারে। আর সত্যি বলতে দ্বিধা নেই, জুন মাসের কুড়ি তারিখই কেন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে, এবং এর সঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঠিক কতখানি যোগ, কী সেই যোগের গুরুত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে ভাসা ভাসা কিছু ধারণা ছিল বটে, কিন্তু তার ভিত্তিতে কি আর লিখে ফেলা যায় নাকি কিছু! একটুখানি লিখতে গেলেও তো আগে অনেকখানি পড়তে হয় ভালো করে বলেই জেনে এবং মেনে এসেছি বরাবর! কিন্তু বিশদে এতটা যে জানব, পড়ব, বই জোগাড় করব, সময় কোথায় হাতে! এখন কেউ বলতেই পারেন, লেখার দরকার কী বাপু! জানো না যখন, লিখো না। লিখতেই হবে এমন মাথার দিব্যি তো দেয়নি তোমাকে কেউ! কথাটা একদিক থেকে ঠিকই। বাধ্যতা তো ছিল না কোনো। কিন্তু ওই যে একটু আগেই বললাম— চাপা আবেগ, চোরা গর্ব, যা মনের মধ্যে সেই কোন কাল থেকে বয়ে নিয়ে চলছি, লালন করছি, নিজের অন্তরের প্রতি নিজের সেই দায়বদ্ধতা অস্বীকার করি কী করে! আমার রাজ্যের নামে একটা দিন উদ্‌যাপিত হবে, আর আমি নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখব, তা কী করে সম্ভব!

কাজেই হাতের সামনে যে সমাধান— হাত বাড়ালেই দৈত্য তো হাজির— খিদমৎ খাটতে এক পায়ে খাড়া— হুকুম করার অপেক্ষা শুধু। দিয়ে দিলাম হুকুম। এখন কী হুকুম দিলাম আর দৈত্য তার উত্তরে কী কী বলল, গোটাটাই এখানে হুবহু তুলে দেওয়া যাক বরং। কেন এমনটা করছি যদি ভাবেন, সে কথায় না-হয় পরে কখনও বিস্তারিতভাবে যাব। আপাতত শুধু বলে রাখি, এমনটা করলাম কারণ আমার ধারণা, আপনাদের মধ্যে অনেকে না হলেও আমার মতো কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা এই বিষয়টা নিয়ে খুব একটা বেশি কিছু ভালোভাবে জানেন না হয়তো। কাজেই আর কিছু না হলেও, আমার আর দৈত্যর মধ্যেকার এই সংলাপ, তাঁদেরও প্রাথমিক জানার কাজটুকু সামলে দেবে। ভালোভাবে জানার তো শেষ নেই কোনো। উৎসাহী পাঠক নিজ গরজেই নিজের পথ খুঁজে নেবেন নিশ্চিত, কিন্তু তার শুরুয়াৎ হিসেবে এখানে আমাদের মধ্যেকার কথোপকথন পাঠ, নেহাতই মন্দ হবে না।

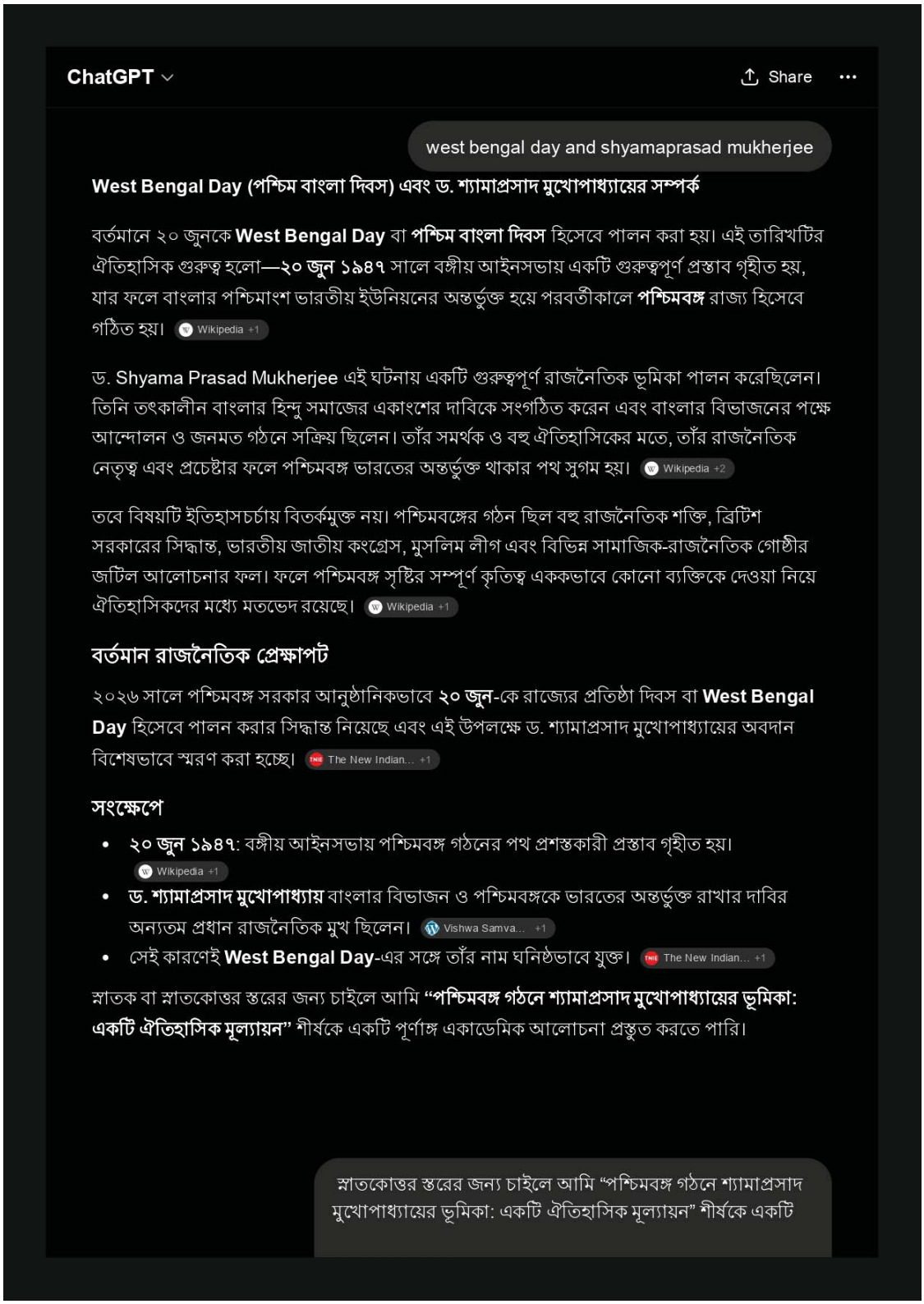

পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক আলোচনা প্রস্তুত করে দাও

পশ্চিমবঙ্গ গঠনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

ভূমিকা

ভারত বিভাগের ইতিহাসে বাংলার বিভাজন একটি জটিল ও বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রাক্কালে বাংলা প্রদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একদিকে ছিল অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব, অন্যদিকে ছিল ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করার দাবি। এই প্রেক্ষাপটে ড. Shyama Prasad Mukherjee-এর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে তিনি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক মুখপাত্র ছিলেন। তবে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন ইতিহাসচর্চায় বিতর্কিত; কেউ তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের ‘প্রতিষ্ঠাতা’ বলে আখ্যায়িত করেন, আবার অন্যরা তাঁর ভূমিকার সীমাবদ্ধতা ও বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর জোর দেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৪০-এর দশকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অস্থির। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশেষত Great Calcutta Killings, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী Huseyn Shaheed Suhrawardy এবং Sarat Chandra Bose একটি "স্বাধীন ও যুক্ত বাংলা" (United Bengal) গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা ভারত ও পাকিস্তান—উভয়ের বাইরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। ফলে তিনি বাংলার হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন।

বাংলার বিভাজনের দাবিতে শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক ভূমিকা

১. বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গঠন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন Hindu Mahasabha-র অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমাবেশ ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন যে, পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত বাংলায় তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে না।

তাঁর নেতৃত্বে "Partition League" এবং অন্যান্য সংগঠন পশ্চিমবাংলাকে ভারতের অংশ করার দাবিকে জনআন্দোলনের রূপ দেয়। সমকালীন সংবাদপত্র, স্মৃতিকথা এবং রাজনৈতিক দলিল থেকে জানা যায় যে এই আন্দোলন কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২. বঙ্গীয় আইনসভায় রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি

১৯৪৭ সালের জুন মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিরা বাংলার বিভাজন এবং ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত দেন। ২০ জুন ১৯৪৭-এর এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পথ প্রশস্ত করে।

ইতিহাসবিদদের মতে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই সিদ্ধান্ত কেবল তাঁর একক প্রচেষ্টার ফল ছিল না; বরং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, স্থানীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের নানা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশও এখানে কার্যকর ছিল।

৩. কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়

শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের সদস্য না হলেও তিনি বাংলার প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। Vallabhbhai Patel-সহ কংগ্রেসের একাংশ বাংলার বিভাজনের দাবিকে সমর্থন করেছিল। এই রাজনৈতিক সমর্থন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিকে আরও শক্তিশালী করে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার ইতিবাচক মূল্যায়ন

অনেক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে—

1. তিনি পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
2. কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমানসহ শিল্প ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ভারতের অংশ হিসেবে রয়ে যায়।
3. পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
4. বাংলার বিভাজনের প্রশ্নে তিনি সংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেন।

এই কারণে সমকালীন ও পরবর্তী বহু রাজনৈতিক ধারায় তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

তবে ইতিহাসচর্চায় তাঁর ভূমিকার সমালোচনাও রয়েছে।

১. সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রশ্ন

মার্কসবাদী ও উপনিবেশ-উত্তর (Postcolonial) ইতিহাসচর্চার একটি অংশ মনে করে যে বাংলার বিভাজনের দাবিতে ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁদের মতে, এই রাজনীতি বাংলার দীর্ঘকালীন সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানকে দুর্বল করে।

২. দেশভাগের মানবিক মূল্য

বাংলা বিভাজনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। ব্যাপক জনবিনিময়, সম্পত্তি হারানো এবং সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সমালোচকদের মতে, বাংলার বিভাজন সমর্থনকারী নেতাদের এই মানবিক বিপর্যয়ের দায়ও আংশিকভাবে বহন করতে হয়।

৩. একক নায়কতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

আধুনিক ইতিহাসবিদরা সাধারণত মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি কোনও একক নেতার অবদান নয়। এটি ছিল—

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি,
- কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কৌশল,
- সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা,
- আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বার্থ,
- এবং জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত ফল।

সুতরাং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একমাত্র বা একক 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে চিহ্নিত করা ইতিহাসের জটিল বাস্তবতাকে সরলীকৃত করে।

ইতিহাসচর্চায় বিতর্ক

বর্তমান সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত—

জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা:
তিনি পশ্চিমবঙ্গের রক্ষক এবং বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার প্রধান প্রবক্তা।

সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা:
তিনি দেশভাগ-পর্বের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি, যার রাজনৈতিক অবস্থান বাংলার বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

উভয় ব্যাখ্যাই আংশিক সত্য বহন করে এবং ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির জন্য উভয়কেই বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বাংলার বিভাজন এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল নয়; বরং এটি ছিল দেশভাগ-পূর্ব ভারতের জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। তাই একজন স্নাতকোত্তর স্তরের গবেষকের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে না একমাত্র নায়ক, না একমাত্র বিভাজনের দায়ী ব্যক্তি হিসেবে দেখা উচিত; বরং তাঁকে তাঁর সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে স্থাপন করে মূল্যায়ন করাই অধিকতর ইতিহাসসম্মত পদ্ধতি।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

1. Freedom at Midnight — Dominique Lapierre & Larry Collins.
2. The Great Partition — Yasmin Khan.
3. The Sole Spokesman — Ayesha Jalal.

4. Remembering Partition — Gyanendra Pandey.
5. Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition and After*.
6. Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932–1947* (এই বিষয়ে গবেষণার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ)।

আমরা যারা সাহিত্যের ছাত্র, আমরা এমন কথা শিখেছি বটে— বিশ্বভুবন আসলে গল্পভুবন— সত্যি বলে এখানে সত্যিই কিছু নেই— সত্য উচ্চারিত হওয়ার সূত্রেই জুড়ে যায় সত্য উৎপাদিত হওয়ার অনুষঙ্গ। এমনকি আমাদের ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাতেও তাঁকেই ঈশ্বর বলে, একমাত্র সত্য বলে মান্য করা হয়, যাঁর সম্পর্কে কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়নি কখনও— ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায়, যিনি কখনও এঁটো হননি। এ এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতার বিষয়— আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অধিকাংশেরই সারা জীবনেও হয়ে ওঠে না এই সত্যের সামান্যতম অভিজ্ঞান— এই আধ্যাত্মিকতার প্রাথমিক অনুধ্যান। সাহিত্য হয়তো একভাবে পারে, সেই পথে প্রবেশের প্রাথমিক সন্ধানটুকু দিতে তবুও।

কিন্তু রোজকার জীবনে, আমাদের প্রাত্যহিকতায় প্রয়োজন ইতিহাসের। বাঙালির নবজাগরণের যুগে, ভারতের নবজাগরণের যুগে, এই প্রাত্যহিকতার প্রয়োজন এবং তার অনুপস্থিতিজনিত অভাব অনুভব করেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নব্যশিক্ষিত বাঙালি সমাজের সামনে রাখলেন ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান। এরপরের বৃত্তান্ত আমাদের অনেকেরই জানা। যত মত তত পথে রচিত হয়ে চলল ইতিহাস। যা রচিত হবে তা-ই সত্য, এমন বিশ্বাসের কাল পেরিয়ে আমরা ক্রমশ এলাম উত্তর সত্যের সময়ে এবং বুঝতে শিখলাম সত্যকে আমরা যতই সহজে গ্রহণ করতে চাই-না-কেন, সহজ সত্য বলে আদতে কিছু নেই।

কাজেই আগাম বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, পূর্ব ধারণাবশত কোনো এক পক্ষ অবলম্বন করে থাকার মধ্যে নিজেকেই ভুলিয়ে রাখা যায় শুধু। সত্যের সঙ্গে মোলাকাতের অমনতর ভঙ্গিতে, প্রচেষ্টায়, নিজেকে নিজেরাই বিপথগামী করে তুলি আমরা। যৌক্তিক বিচার ও তদ্‌জনিত তার্কিকতা মাধ্যমেই আমাদের ইতিহাসকে দেখতে শিখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন ভয়মুক্ত মন, প্রাচীরমুক্ত জ্ঞান আর প্রত্যয়যুক্ত সম্মুখ দৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গ দিবসে এইসবই হয়ে উঠুক আমাদের বিদ্যায়তনিক জ্ঞানচর্চার অঙ্গীকার।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি

১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচন: পশ্চিমবঙ্গ দিবসের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অভিজিৎ বাগ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করেছিল। কারণ এই আইনেই পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতীয় সংবিধান গড়ে ওঠে। এই আইনেই ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের কাছে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের এতদিনের দাবীদাওয়ার বেশ কিছুটা সুরাহা হয়, যথা; ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য গুলি নিয়ে কেন্দ্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের সরকার গঠন, কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইন সভার ব্যবস্থা, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, তপসিলি সদস্যদের জন্য পুনা চুক্তি অনুসারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এছাড়া এই আইন অনুসারেই ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল এককভাবে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ১৯৩৮ সালে আসামে মোট আটটি প্রদেশে যৌথভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলায় কংগ্রেস সরকার গড়তে পারেনি। অন্যদিকে মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশ হলেও লীগ এই প্রদেশগুলিতে ভাল ফল করতে পারেনি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যে কোন নির্বাচনই জনগণের কাছে একটি আশা-আশঙ্কার দোলাচল সৃষ্টি করে। তেমনিই অখন্ড বঙ্গের ১৯৩৭ সালের এই নির্বাচন বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ এবং একই সঙ্গে শঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস, লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি কেউই এককভাবে মন্ত্রীসভা গঠনে পর্যাপ্ত আসন লাভ করেনি। প্রজা পার্টি দলের ফজলুল হক কংগ্রেসের কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থন চাইলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে বাঁধা আসে। তিনি নলিনী রঞ্জন সরকারকে মন্ত্রী করতে চাইলেও কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি এছাড়া আরও একটি বাঁধা ছিল বিধান রায় এবং শরৎ বসুর বিরোধ। এই অবস্থায় বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষকপ্রজা পার্টি মুসলিম লিগের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে। যদিও লীগ নেতারা হকের বাঙ্গালিয়ানার জন্য তাঁকে পছন্দ করতেন না তবে সরকার গঠনের সুযোগ ছাড়তে চায়নি লীগ। অন্যদিকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় ভিন্ন ধারার স্রোত বহমান হয়। যাইহোক অখন্ড বঙ্গে একটি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে বাঙলা ভাগ হত কিনা সন্দেহ এবং মুসলিম লিগ সম্ভবত বাংলায় এত সক্রিয় হতে পারত না। ফজলুল হক জমিদারী প্রথা অবলুপ্তি ইত্যাদি কিছু সংস্কারের পক্ষে ছিলেন সম্ভবত কংগ্রেসের কাছে এই ধরনের কোন আন্দোলন সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কংগ্রেস হাই কম্যান্ড মুসলিম লিগের সঙ্গে কোন সমঝোতা করতে রাজী ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে লীগ নেতাদের সঙ্গে হক সাহেবের বিরোধ বাঁধতে শুরু করে। এমনকি কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরা হকের ভূমি রাজস্ব নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করেন। এই মন্ত্রীসভার অন্যতম একটি বিতর্কিত বিল ছিল বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিল। এই শিক্ষা বিলের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু প্রভাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে

মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনা। এই প্রস্তাবিত বোর্ডের সদস্য ছিল ৫০ জন। এই বিলের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ অনেক বিশিষ্টজন মত প্রকাশ করেন। এই বিলকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা যায়। এরপর কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি (সংশোধন), ১৯৩৯ বিলটি নিয়েও একই অভিযোগ ওঠে লীগ-প্রজা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতারা এই বিলের বিরোধিতা করেন কারণ তাঁদের মতে, কলকাতা কর্পোরেশনে হিন্দুদের প্রভাব মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে। এছাড়া সরকারী চাকরীতে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ পদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের বিষয়টি হক সাহেব বিধান সভায় ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এরপরেই আমারা দেখব সারা ভারত হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে (২১ তম) ড. শ্যামাপ্রসাদ হক মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে ১৭ টি অভিযোগ আনেন। যাইহোক ধীরে ধীরে হক সাহেবের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করেন। মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলাতে মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিধানসভায় কংগ্রেস বা অন্য হিন্দু দলগুলোর লীগ-প্রজা মন্ত্রীসভা দ্বারা আনিত বিভিন্ন বিলের বিরোধিতা করার মনোভাব থেকে বাংলার সাধারণ বাঙালি মুসলমান মননে হিন্দুনেতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে আপামর হিন্দু বাঙালি এই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে আস্থা হারাতে থাকেন। এদিকে ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' এর ফলে সমগ্র দেশে মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু মুসলিমদের মনে একটা নতুন আশা জাগাতে সক্ষম হয়। একটা মুক্তির স্বাদ যেন তাঁদের মনে স্বপ্ন জাগায়। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

১৯৪৫ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ইংল্যান্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে। এই দল ভারতের সমস্যা সমাধানে তৎপর ছিল। এরপর ভারতে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যাইহোক এই নির্বাচনে মুসলিম লিগ পাঞ্জাব ও বাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেশি আসন জয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করে। বাংলায় লীগ ১১৯ টি আসনে লড়াই করে ১১৩ আসন লাভ করে। ততদিনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। যাইহোক মুসলিম লিগের সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ততদিনে পাকিস্তান দাবী সারা দেশে একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ৪-৬ এপ্রিল ১৯৪৭ সালে হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক সম্মেলন হুগলী জেলার তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতির ভাষণ দেন নির্মল চন্দ্র চট্টপাধ্যায়। তিনি বলেন হিন্দু বাঙালিদের নিয়ে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন এটা বঙ্গভাগের প্রশ্ন নয় বরং এটা হিন্দু বাঙালিদের জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন। এই সভায় ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলা ভাগ করে দুই সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে শান্তিতে বসবাস করার করার কথা বলেন। হিন্দু মহাসভা হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে ভারত ইউনিয়নের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের তাগিদ অনুভব করে। বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও অনেকেই বাংলা ভাগের প্রস্তাব মেনে নেন যেমন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। অন্যদিকে কিরণশঙ্কর রায়, শরত বসু, সোহরাবরদি, নাজিমুদ্দিন প্রমুখদের আলোচনায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই সমস্ত কিছুর অবসান ঘটিয়ে ৩ রা জুন ১৯৪৭ যেদিন মাউন্টবাটন প্লান ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয়, ভারত পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ব্রিটিশ সরকার। সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হবে। এরপর বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা ২০ জুন ১৯৪৭ সালের বাঙলা ভাগের বিষয়ে নিজেদের মতামত জানাতে উপস্থিত হন। ২২০ জন উপস্থিত সদস্যের মধ্যে ২১৬ জন ভোট দেন। বেশীরভাগ সদস্য অবিভক্ত বাংলার পক্ষে অর্থাৎ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ভোট দেন। এরপর ওই খানেই আরেকটি পৃথক অধিবেশনে শুধু হিন্দু প্রধান অঞ্চলের বিধায়কেরা মিলিত হন এবং নিজেদের মধ্যে ভোটাভুটিতে দলমত নির্বিশেষে বেশীরভাগ সদস্য তাঁরা বাংলাকে ভাগ করে শুধু হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত দেন। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাই এদিনটি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা যেতেই পারে।

যাইহোক বাংলার লীগ সরকারের ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা চলাকালীন নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন, সমগ্র দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং হিন্দু মহাসভার নাছোড় মনোভাব বঙ্গ বিভাগ ছাড়া উপায় ছিল না। ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এই আইন বলেই দুটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যদিকে ১৮ আগস্ট সীমান্ত কমিশনের সুপারিশ বের হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্থির হয় বাংলার কোন কোন অঞ্চল পাকিস্তান ও ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন অঞ্চল গুলিকে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হবে। তবে কোন পক্ষই এই ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট না হলেও তৎক্ষণাৎ দাঙ্গা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্য কোন ভিন্ন উপায়ও ছিল না।

সূত্র-নির্দেশঃ

১। ফজলুল হক-জীবন ও রাজনীতি, ড. সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১
২। দেশভাগের অর্জন বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭, জয়া চ্যাটার্জি, মাওলা ব্রাদ্রাস, ঢাকা, ২০১৬
৩। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আক্ট, ১৯৩৫
৪। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৭০৭-১৯৬৪, সিদ্ধার্থ গুহ রায়, সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২
৫। ইন্ডিয়াস স্ট্যাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স, বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, সুচেতা মহাজন, কে এন পানিক্কার, পেঙ্গুইন রান্ডম হাউস, ১৯৮৭

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি

পশ্চিমবঙ্গ: যে মাটির রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস

স্নেহা কর্মকার

ভূমিকা:

ফাঁসির মঞ্চ কাঁপেনি, কেঁপেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত; যখন এক কিশোরের মুখে ফুটেছিল হাসি। সেই কিশোর ক্ষুদিরাম, সেই ভূমি বাংলা।

ইতিহাসের পাতায় কিছু ভূমির নাম শুধু স্থান হিসেবে লেখা থাকে না, লেখা থাকে সংগ্রাম, সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গ তেমনই এক ভূমি। ভারতের স্বাধীনতার সূর্য যখন দিগন্তে এখনও উদিত হয়নি, তখন বাংলার বুকে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের প্রথম অগ্নিশিখা। ক্ষুদিরামের হাসি, নেতাজির বজ্রকণ্ঠ এবং অগণিত শহিদের রক্তে রঞ্জিত এই মাটি স্বাধীনতার ইতিহাসকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, তাকে দিয়েছে নতুন গতি ও নতুন শক্তি।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের অবদান শুধু কয়েকটি আন্দোলন বা কয়েকজন নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সাহস, ত্যাগ এবং অদম্য দেশপ্রেমের এক অমর গাথা।

মূল আলোচনা:

যখন সমগ্র ভারত ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলে বন্দি, তখন বিদ্রোহের প্রথম আগুন জ্বলে উঠেছিল বাংলার বুকে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছিল সেই আগুনের প্রথম বিস্ফোরণ। এই আন্দোলনে বাংলার মানুষ শুধু প্রতিবাদ করেনি, তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল—স্বাধীনতা কোনো অনুগ্রহ নয়, এটি অধিকার। সেই থেকেই স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের জন্ম, যা ব্রিটিশ অর্থনীতির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

এই উত্তাল সময়েই জন্ম নেয় একের পর এক বিপ্লবী চেতনা। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী হাসতে হাসতে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন, যেন মৃত্যুও তাঁদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। বাঘা যতীন নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়েছিলেন, আর মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রামের মাটিতে বিদ্রোহের এমন ইতিহাস তৈরি করেন, যা আজও বীরত্বের প্রতীক।

এই লড়াই শুধু অস্ত্রের ছিল না, এটি ছিল মননেরও যুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখায় জাতিকে জাগিয়েছিলেন, আর কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিদ্রোহী কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বান। সাহিত্য, সংগীত ও চিন্তাধারার মাধ্যমে বাংলার মানুষ স্বাধীনতার আগুনকে আরও জ্বালিয়ে তুলেছিল।

ধীরে ধীরে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাংলার ছাত্র-যুবকরা আবারও সামনে এসে দাঁড়ায়। বহু কারাবরণ, বহু ত্যাগ—তবুও তাদের মনোবল ভাঙেনি। আর শেষ পর্যন্ত সেই দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের ফল হিসেবে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

উপসংহার:

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের অবদান কোনো সাধারণ অধ্যায় নয়—এটি এক অগ্নিগর্ভ উত্তরাধিকার। যে মাটিতে ক্ষুদিরামের হাসি মৃত্যুকেও পরাজিত করেছিল, যে আকাশে নজরুলের বিদ্রোহ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, সেই বাংলার ত্যাগের ইতিহাস আজও আমাদের রক্তে দেশপ্রেমের উষ্ণতা জাগায়। স্বাধীনতা আমাদের পাওয়া নয়, অর্জন—আর সেই অর্জনের পথে বাংলার অসংখ্য বিপ্লবী, চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ ইতিহাসকে চিরকাল আলোয় ভরিয়ে রাখবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের নাম শুধু মানচিত্রে নয়, ভারতের স্বাধীনতার হৃদয়ে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

ছাত্রী, চতুর্থ সেমেস্টার, গণিত বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি

পশ্চিমবঙ্গ: ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

অঙ্কিতা মাইতি

গৌরবময় ইতিহাস ও নবাবি ঐতিহ্য

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি রাজ্য নয়, এটি ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও প্রগতিশীল চিন্তার এক অনন্য কেন্দ্র। প্রাচীন ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই রাজ্যের বিশেষত্ব হলো, এখানে অতীতের গৌরব ও বর্তমানের অগ্রগতি একসঙ্গে পথ চলেছে!

পশ্চিমবঙ্গের এই গৌরবময় পরিচয়ের শিকড় লুকিয়ে রয়েছে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, নবাবি আমলের সমৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অসংখ্য স্মৃতি আজও এ রাজ্যের মাটিতে জীবন্ত হয়ে আছে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ একসময় বাংলার রাজধানী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীন সত্তা রক্ষার সংগ্রাম ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধের পরই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে।

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, কাত্রা মসজিদ, কাঠগোলা বাগানবাড়ি, নাশিপুর রাজবাড়ি এবং জাফরগঞ্জ কবরস্থান আজও সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক নগরী শুধু নবাবি ঐশ্বর্যের স্মারকই নয়, বরং বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার। একসময় জগৎ শেঠদের মতো প্রভাবশালী ব্যাংকার ও বণিক পরিবারের কর্মকাণ্ডও এই অঞ্চলকে সমগ্র উপমহাদেশে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছিল।

বাংলার নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার

তবে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় শুধু তার নবাবি ইতিহাস বা ঔপনিবেশিক অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার সময়ে এই বাংলার মাটিতেই জন্ম নিয়েছিল নবজাগরণের আলো, যা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল!

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন কুসংস্কার, অশিক্ষা ও সামাজিক বৈষম্য সমাজকে গ্রাস করেছিল, তখন এই বাংলার মাটিতেই জন্ম নিয়েছিলেন একদল মহাপুরুষ, যাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মের মাধ্যমে সমাজকে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ এবং নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে আধুনিক ভারতের নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর অসামান্য মানবতাবোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং নারীশিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সমাজসংস্কারের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

অন্যদিকে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সার্বজনীন ধর্মচেতনা ও মানবপ্রেমের বাণীর মাধ্যমে মানুষকে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্য ও সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও মানবসেবার বার্তা বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেন। তিনি যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাস, কর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের চিন্তা ও আদর্শ শুধু তৎকালীন সমাজেই নয়, বর্তমান যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। মানবতা, শিক্ষা, সাম্য ও প্রগতির যে বীজ তাঁরা রোপণ করেছিলেন, তার ফল আজও পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ভোগ করে চলেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের অবদান

পশ্চিমবঙ্গের মাটি শুধু নবজাগরণের আলোয় আলোকিত হয়নি, সিক্ত হয়েছে অসংখ্য বিপ্লবীর আত্মত্যাগের রক্তে। স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এ বাংলার বহু সন্তান হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, কারাবরণের কষ্ট সহ্য করেছেন এবং দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তাঁদের সেই অমর আত্মবলিদান আজও বাঙালির চেতনাকে জাগ্রত করে এবং দেশপ্রেমের অনিঃশেষ প্রেরণা জোগায়। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

এই বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো এক মহান দেশনায়ক, যাঁর অদম্য সাহস, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং আপসহীন দেশপ্রেম স্বাধীনতার আন্দোলনকে এক নতুন গতি প্রদান করেছিল। তাঁর ঐতিহাসিক আহ্বান— "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"— আজও কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রেমের শিখা জ্বালিয়ে রাখে। একইভাবে ক্ষুদিরাম বসু অতি অল্প বয়সে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আত্মত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ফাঁসির মঞ্চে তাঁর নির্ভীক হাসি আজও বাঙালির সাহস ও আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে আছে।

এছাড়াও প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাতঙ্গিনী হাজরা এবং অসংখ্য পরিচিত-অপরিচিত বিপ্লবীর ত্যাগ ও বীরত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের আত্মত্যাগ শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাস নয়, বরং দেশপ্রেম, সাহস, আত্মমর্যাদা ও কর্তব্যবোধের এক চিরন্তন শিক্ষা। তাঁদের আদর্শ আজও আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং উন্নত সমাজ গঠনের প্রেরণা জোগায়। তাই পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

বাংলা সাহিত্য: ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার পথে

যে বাংলা ক্ষুদিরামের হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে ওঠার সাক্ষী, যে বাংলা নেতাজির বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক শুনেছে, সেই বাংলাই আবার রবীন্দ্রনাথের কলমে মানবতার গান গেয়েছে, নজরুলের কণ্ঠে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস যেমন সংগ্রামের, তেমনি তার সাহিত্যও জাগরণ, স্বপ্ন ও চেতনার এক অনন্ত উৎস।

বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম স্মরণে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সাহিত্য, সংগীত ও দর্শন শুধু বাংলাকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় যেমন বিদ্রোহের বজ্রধ্বনি শোনা যায়, তেমনি মানবতা ও সাম্যের আহ্বানও ধ্বনিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছিল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম ও সমাজবাস্তবতাকে সহজ অথচ গভীর ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে অমর করে রেখেছেন, আর জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় বাংলার রূপকে এমনভাবে এঁকেছেন, যা আজও পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে নারী সাহিত্যিকদের অবদানও অনস্বীকার্য। আশাপূর্ণা দেবী নারীর আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখায় সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামকে সামনে এনেছেন। তাঁদের সাহিত্য শুধু গল্প নয়, সমাজকে নতুন করে ভাবার এক আয়নাও বটে।

সময়ের সঙ্গে সাহিত্যও পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় সাহিত্য ছিল সমাজসংস্কার, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রধান মাধ্যম; আজও সেই ধারা বহমান, তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনের নানা সংকট, প্রযুক্তিনির্ভরতা, নগরজীবনের জটিলতা এবং বিশ্বায়নের প্রভাব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে এক সুন্দর সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। তাঁদের উত্তরসূরিরাও নতুন সময়ের কথা, নতুন প্রজন্মের ভাবনা এবং সমাজের পরিবর্তিত চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরছেন।

বিষয় ও ভাষার পরিবর্তন ঘটলেও বাংলা সাহিত্যের প্রাণশক্তি আজও একই রয়েছে—মানুষের কথা বলা, মানুষের পাশে থাকা। আর এই ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ তার সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করেই আধুনিকতার পথে এগিয়ে চলেছে।

লোকসংস্কৃতি, উৎসব ও সম্প্রীতির ঐতিহ্য

ইতিহাসের গৌরব, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সাহিত্যের অমূল্য সম্পদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে তার সংস্কৃতির গভীরে। বাংলার মাটিতে পা রাখলেই যেন অনুভব করা যায় এক অদ্ভুত মমতা, এক চিরচেনা আপন সুর। গ্রামের মেঠোপথ, শরতের কাশফুল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি কিংবা দূর থেকে ভেসে আসা বাউলের গান—সবকিছু মিলিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়।

লোকসংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, টুসু কিংবা ছৌ নৃত্য শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এগুলি বাংলার মানুষের জীবন, আবেগ, বিশ্বাস এবং দর্শনেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ঐতিহ্য বাংলার মাটিতে বেঁচে আছে এবং আজও আমাদের শিকড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উৎসবপ্রিয় বাঙালির জীবনে উৎসব যেন এক অনিবার্য আবেগ। দুর্গাপূজা এলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্ত নতুন প্রাণে জেগে ওঠে। আলো, রঙ, শিল্পকলা এবং মানুষের মিলনমেলায় তখন গোটা বাংলা এক বৃহৎ পরিবারের রূপ ধারণ করে। তবে পশ্চিমবঙ্গের সৌন্দর্য শুধু এখানেই নয়। ঈদের আনন্দ, বড়দিনের উৎসব, গুরুপরব কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এ রাজ্যের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে আরও

সুদৃঢ় করে। ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে উৎসব পালন করার এই সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গকে সত্যিই অনন্য করে তুলেছে।

সময়ের সঙ্গে জীবনযাত্রা বদলেছে, প্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাংলার মানুষ আজও তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমান ভালোবাসায় আগলে রেখেছে। এই ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সহাবস্থানই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনের আকর্ষণ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলিও এ রাজ্যের পরিচয়কে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার সৌন্দর্যের নানা রূপে পশ্চিমবঙ্গকে সাজিয়ে তুলেছে। উত্তরে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত দার্জিলিংয়ের পাহাড়, সবুজ চা-বাগান ও মেঘে ঢাকা পথ যেমন পর্যটকদের মুগ্ধ করে, তেমনি দক্ষিণে সুন্দরবনের রহস্যময় ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলার প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে এক বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।

শুধু প্রকৃতিই নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের অসংখ্য স্মারক। মুর্শিদাবাদের নবাবি ঐতিহ্য, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির, শান্তিনিকেতন এবং কলকাতার ঔপনিবেশিক স্থাপত্য অতীত ও বর্তমানের এক অনন্য সেতুবন্ধন রচনা করেছে। আবার দিঘার সমুদ্রতট, ডুয়ার্সের অরণ্য কিংবা পুরুলিয়ার পাহাড়ি প্রাকৃতিক দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্ব এখানেই যে, এখানে প্রকৃতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এই রাজ্যের প্রতিটি নদী, পাহাড়, অরণ্য কিংবা ঐতিহাসিক স্থাপত্য শুধু দর্শনীয় স্থান নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গের গৌরবময় ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক। এই ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করেই পশ্চিমবঙ্গ আজ আধুনিকতার পথে এগিয়ে চলেছে, অথচ কখনও তার শিকড়কে বিস্মৃত হয়নি।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ

অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করেই পশ্চিমবঙ্গ আজ আধুনিকতার পথে এগিয়ে চলেছে। যে বাংলা একসময় নবজাগরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার আলো সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিল, আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (ISI)-এর মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশের বৌদ্ধিক ও গবেষণাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষার প্রতি এই গভীর অনুরাগই পশ্চিমবঙ্গকে জ্ঞানচর্চার এক অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ আজ দেশের অন্যতম তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্ম নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও বাঙালি যুবক-যুবতীরা তাঁদের মেধা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

তবে আধুনিকতার এই অগ্রযাত্রার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ তার শিকড়কে ভুলে যায়নি। আজকের তরুণ প্রজন্ম একদিকে যেমন প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাংলা সাহিত্য, দুর্গাপূজা কিংবা লোকসংস্কৃতির প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করে। অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের অগ্রগতির এই সুন্দর সমন্বয়ই পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত শক্তি। তাই পশ্চিমবঙ্গ শুধু তার ইতিহাসের জন্য নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্যও সমানভাবে গর্বের অধিকারী।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি রাজ্যের নাম নয়; এটি এক গৌরবময় ইতিহাস, এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, এক অদম্য চেতনা এবং এক অনন্ত সম্ভাবনার নাম। নবাবি আমলের ঐতিহ্য, নবজাগরণের আলোকপ্রভা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, সাহিত্য-সংস্কৃতির অপার ঐশ্বর্য, লোকঐতিহ্যের প্রাণস্পন্দন এবং সম্প্রীতির বন্ধনে গড়ে ওঠা সমাজ—সবকিছু মিলিয়েই গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র পরিচয়। একই সঙ্গে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ নতুন প্রজন্ম এ রাজ্যকে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

অতীতের গৌরবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, বর্তমানের অর্জনকে সঙ্গী করে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গ আজও নিজের পথ নির্মাণ করে চলেছে। এখানেই ঐতিহ্য আধুনিকতার কাছে হার মানেনি, আবার আধুনিকতাও ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে এগোয়নি; বরং উভয়েই পরস্পরের হাত ধরে এক সুন্দর, সুষম ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলেছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সত্যিই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন—যার শিকড় ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত, আর যার দৃষ্টি নিবদ্ধ ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার দিকে ।

ছাত্রী, চতুর্থ সেমেস্টার, গণিত বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি

পশ্চিমবঙ্গ: ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র

দীপান্বিতা জানা

পশ্চিমবঙ্গ কেবল ভারতের মানচিত্রের এক টুকরো কোন অঙ্গরাজ্য নয় । পশ্চিমবঙ্গ মানে এক চেতনা এক আবেগ। যেখানে মাটির ধুলোতে মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা, নজরুলের সাম্যবাদ আর নেতাজির আপসহীন লড়াই তার পরিচয়কে কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বেঁধে রাখা অসম্ভব। এখানে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর গণতন্ত্র এই তিনটি জিনিস আলাদা কিছু নয় বরং একই নদীর তিনটি ধারা, যা একে অপরের হাত ধরে যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে।

বাংলার সংস্কৃতি আমাদের সবসময় মানুষকে ভালোবাসতে আর মেলাতে শিখিয়েছে, আর এটাই হলো একটা সুস্থ গণতন্ত্রের আসল ভিত্তি।

পশ্চিমবঙ্গের সেরা ঐতিহ্য দুর্গাপূজা আজ বিশ্বমঞ্চে [ইউনেস্কোর হেরিটেজ হিসেবে] স্বীকৃত। আমরা যেমন দুর্গা পুজো পালন করি ঠিক তেমন একইভাবে একসাথে পালন করি ঈদ, খ্রিস্টমাস যেখানে জাতপাত বা ধর্মের কোন ভেদাভেদ থাকে না । যা গণতন্ত্রের মূল কথা যেখানে প্রতিটি মানুষের মর্যাদার সমান ।

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায় কিংবা কফি হাউসের আড্ডা বাঙালির ঐতিহ্যই হলো প্রশ্ন করা এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করা। কেউ কিছু চাপিয়ে দিলেই বাঙালি তা মেনে নেয় না। বিচার করে যুক্তি দিয়ে । এই সংস্কৃতিই বাংলার মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করেছে, যা গণতন্ত্রকে মজবুত রাখে।

বাংলার বাউল-ফকিরদের গান, লালন শাহ বা নজরুলের গান [একই বৃন্তে দুটি কুসুম] আমাদের একে অপরের সাথে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে শেখায়

সংস্কৃতির এই উদারতাই পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে বহু বছর ধরে হিংসা ও বিভেদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখে সকল ধর্ম জাতিকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

সময় বদলেছে, আর বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের চেনা ঐতিহ্য আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গায়েও কিছু আঁচ লেগেছে, যা আজ আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

1.সংস্কৃতির ওপর রাজনীতির ছায়া :- বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের উৎসব, ক্লাব কালচার এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর ওপর রাজনীতির প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে চলেছে। সংস্কৃতির যে নিজস্ব একটা স্বাধীনতা কোথাও একটা দলীয় বৃত্তে আটকে পড়ছে।

2.ভিন্নমতের প্রতি অসহনশীলতা: যে বাংলা একসময় অন্যের মতকে প্রবল সম্মানের সাথে শুনত, আজ সেখানে সামাজিক মাধ্যম (Social Media) বা বাস্তব জীবনে ভিন্ন মতপ্রকাশ করলেই চরম ট্রোলিং বা ঝগড়ার শিকার হতে হচ্ছে। যুক্তির জায়গা নিচ্ছে চিৎকার, যা গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়।

3.ডিজিটাল দূরত্ব: নতুন প্রজন্ম বইপাড়া হোক নাটকের মঞ্চ থেকে দূরে সরে গিয়ে মোবাইলের স্ক্রিনে ও স্যোশাল মিডিয়ার আসক্ত হচ্ছে । ফলস্বরূপ সামাজিকতার অভাব ।

তবে বাংলার পুরাতন ঐতিহ্য গর্ব আবারো ফিরে আসবে যদি আমরা কয়েকটি বিষয়ের মাথায় রাখি :-

উৎসব বা শিল্পকে কোনো রাজনৈতিক রঙে না রাঙিয়ে, তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিতে হবে। শিল্পীরা যেন

কোনো ভয় বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া তাদের কাজকর্ম করতে পারে ।
স্কুল, college ও পাড়ার স্তরে আবার সুস্থ বিতর্কসভার আয়োজন করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে হবে যে এবং মানতে হবে যে , "তোমার মতের সাথে আমার অমিল হতেই পারে, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষা করার নামই গণতন্ত্র।"
আমাদের বাউল, ছৌ শিল্পী, পটচিত্রকর বা মৃৎশিল্পীদের কেবল ভোটের বিজ্ঞাপনে বা উৎসবের মরশুমে মনে রাখলে চলবে না। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁদের শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করে স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে বাংলার এই মানুষগুলো বিশ্ব তথা দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় মর্যাদা পায় ।
শিশুদের কেবল মুখস্থ বিদ্যা অথবা নম্বরে ভিত্তি করে সামিল না করে, পাঠ্যক্রমে বাংলার মনীষীদের জীবন ও তাঁদের মানবিক মূল্যবোধের গল্প আরও বেশি করে শেখানো উচিত। এতে ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে যেমন জানবে এবং তাদের আগ্রহ বাড়বে । যা ভিশন জরুরি।

উপসংহার

সবশেষে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মাটি আর মানুষের টান বড় অদ্ভুত। যুগের সাথে সাথে সময় বদলেছে, মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং রাজনীতিতে সাথে অনেক ঝড়ঝাপটা এসেছে ,পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও বাংলার মানুষের মন থেকে আতিথেয়তা হোক বা ভালোবাসা অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। বর্তমানের বেশ কিছু পরিস্থিতিতে তার প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তবে বর্তমানে কিছু খামতি বা সমস্যা নেই বললে ভুল বলা হবে কিন্তু তা সবকিছুই সাময়িক। আমরা যদি আমাদের মনের সংকীর্ণতা ভুলে আবার সেই পুরনো উদারতা, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা আর একে অপরের মতকে সম্মান জানানোর গণতান্ত্রিক অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে পারি আশা করা যায় আমাদের বাংলা আবার সবার সেরা হয়ে উঠবে।

ছাত্রী, চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি

Preserving the Folk Tradition and Cultural Heritage of West Bengal

Rimpa Sadhukhan

West Bengal is a land of rich cultural diversity and vibrant folk traditions. From Baul songs and Jhumur dance to Patachitra paintings and Chhau performances, the state's cultural heritage reflects the history, beliefs, and creativity of its people. Preserving these traditions is essential for maintaining the unique identity of West Bengal and passing its values to future generations. The folk culture of West Bengal has developed over centuries through the contributions of rural communities. The soulful music of the Bauls, recognized internationally for its spiritual message, represents harmony and humanism. Traditional art forms such as Patachitra, Dokra metal craft, terracotta work of Bishnupur, and various folk dances showcase the artistic excellence of the people. Festivals, local fairs, and cultural gatherings also play a vital role in keeping these traditions alive. However, modernization, urbanization, and the influence of global popular culture pose serious challenges to folk traditions. Many folk artists struggle financially and are unable to attract younger generations to continue their family traditions. As a result, several valuable art forms are gradually disappearing. To preserve the cultural heritage of West Bengal, collective efforts are necessary. The government should provide financial assistance, scholarships, and training programs for folk artists. Schools and colleges can include folk culture in their curriculum to create awareness among students. Cultural festivals, exhibitions, and competitions should be organized regularly to encourage participation and appreciation. Digital platforms can also be used to document and promote folk music, dance, and crafts to a wider audience. Tourism can contribute significantly to cultural preservation. Heritage sites such as attract visitors and help local artisans earn a livelihood. Supporting traditional craftsmen by purchasing handmade products can further strengthen the cultural economy.

In conclusion, the folk tradition and cultural heritage of West Bengal are priceless treasures that connect the present with the past. Their preservation is not only a responsibility but also a necessity for safeguarding the state's cultural identity. By promoting awareness, supporting artists, and encouraging cultural education, we can ensure that the rich heritage of West Bengal continues to flourish for generations to come.

ছাত্রী, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি

The Cultural Heritage of West Bengal: A Journey Through Literature, Art, and Tradition

Momtah Khatun

West Bengal is one of the most culturally rich states in India. Its heritage is a beautiful blend of literature, art, music, festivals, and traditions that have influenced not only India but also the world. The cultural heritage of West Bengal reflects the creativity, wisdom, and spirit of its people.

Literature is an important part of Bengal's identity. The state has produced many great writers and poets, including Rabindranath Tagore, the first Asian Nobel Prize winner. His poems, songs, and stories continue to inspire people across the globe. Other famous literary figures such as Bankim Chandra Chattopadhyay and Sarat Chandra Chattopadhyay have also enriched Bengali literature.

West Bengal is equally famous for its art and music. Traditional folk forms such as Baul music, Chhau dance, and terracotta art showcase the state's unique artistic heritage. Bengali cinema, theatre, and modern art have also gained national and international recognition.

The traditions and festivals of West Bengal add color and joy to its cultural life. Durga Puja, the biggest festival of the state, brings people together regardless of their social or religious backgrounds. Other festivals, folk fairs, and cultural events help preserve the customs and values passed down through generations.

West Bengal Day is an ideal occasion to celebrate this rich heritage. It reminds us of the achievements of our ancestors and encourages us to preserve our culture for future generations. By honoring its literature, art, and traditions, we keep alive the spirit of West Bengal.

In conclusion, the cultural heritage of West Bengal is a priceless treasure. It represents a journey through creativity, knowledge, and tradition that continues to inspire people around the world.

ছাত্রী, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি